দশম অধ্যায়

# জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

কোনো দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে সে দেশের জাতীয় সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমাণের ওপর। যে দেশ জাতীয় সম্পদে যত সমৃদ্ধ সে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা ততবেশি। তাই অর্থনীতি সম্বন্ধে জানতে হলে প্রথমেই সম্পদ সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। আবার একটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বুঝতে হলে সে দেশের সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি জানতে হবে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় এই উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি ভিন্ন হয়। যে পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং নিয়মনীতির আওতায় কোনো দেশের অর্থনীতি পরিচালিত হয়, তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ অধ্যায়ে আমরা জাতীয় সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে জানার পাশাপাশি বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের বিষয়টিও জানব।

**এ অধ্যায় শেষে আমরা–**

- জাতীয় সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধের উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারব;
- বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বণ্টন পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারব;
- সম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে সচেতন হব;
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হব।

## জাতীয় সম্পদের ধারণা

আমরা সাধারণত অর্থ, জমিজমা, বাড়িঘর, নানারকম প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী দ্রব্যসামগ্রী, স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতিকে সম্পদ বলে থাকি। প্রকৃত অর্থে কোনো বস্তু বা দ্রব্যকে সম্পদ বলতে হলে সে বস্তুর উপযোগ, অপ্রাচুর্য, বাহ্যিকতা এবং হস্তান্তরযোগ্যতা থাকতে হবে। এগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

**উপযোগ :** মানুষের অভাব পূরণে কোনো দ্রব্যের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। যেমন, মানুষের বস্ত্রের প্রয়োজন বা অভাব আছে। শার্ট, প্যান্ট, শাড়ি- এসব দ্রব্যের বস্ত্রের অভাব পূরণের ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ এগুলোর উপযোগ আছে।

**অপ্রাচুর্য :** কোনো দ্রব্য বা সেবার চাহিদার তুলনায় যোগান বা সরবরাহের পরিমাণ কম হলে দ্রব্যটির অপ্রাচুর্য দেখা দেয়। যেমন- খাদ্য। যে কোনো দেশে যে কোনো সময়ে খাদ্যের সরবরাহ এর চাহিদার তুলনায় কম। সেই জন্য খাদ্য পেতে হলে এর দাম পরিশোধ করতে হয়। অর্থাৎ খাদ্যের অপ্রাচুর্য আছে। আবার, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য মানুষের প্রতিমুহূর্তেই বাতাসের প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতিতে বাতাস অফুরন্ত হওয়ায় প্রয়োজনের তুলনায় এর সরবরাহ বেশি। তাই বাতাসের জন্য মানুষকে কোনো দাম দিতে হয় না। অর্থাৎ বলা যায়, বাতাসের অপ্রাচুর্য নেই। শুধু উপযোগ ও অপ্রাচুর্য থাকলে একটি জিনিস সম্পদ নাও হতে পারে, যেমন-স্বাস্থ্যের অপ্রাচুর্য এবং উপযোগিতা আছে কিন্তু **বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা** না থাকায় একে সম্পদ বলা যাবে না। তবে কোনো স্বাস্থ্যবান পুরুষ যখন যদি স্বাস্থ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবেন তবে তার ঐ বিশেষ ধরনের স্বাস্থ্যটি সম্পদ বলে গণ্য হবে।

### সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

সম্পদকে ব্যক্তিগত, একান্ত ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক–এই পাঁচ শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জায়গা–জমি, বাড়িঘর, কলকারখানা, অর্থসম্পদ, গাড়ি, দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পদ। নিজস্ব প্রতিভা, ব্যক্তির দক্ষতা ইত্যাদি যদিও হস্তান্তরযোগ্য নয়, কিন্তু ব্যক্তি এগুলো ব্যবহার করে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে। তাই এগুলো একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

সমাজের সকলে সম্মিলিতভাবে যে সকল সম্পদ ভোগ করে, সেগুলো সমষ্টিগত সম্পদ। এই সম্পদের ওপরে সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকে এবং এগুলোর প্রতি তাদের সমান দায়িত্বও রয়েছে। রাস্তাঘাট, রেলপথ, বাঁধ, পার্ক, সরকারি হাসপাতাল ও স্কুল, রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সকল প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন– বনাঞ্চল, খনিজসম্পদ, নদ–নদী ইত্যাদি) প্রভৃতি সমষ্টিগত সম্পদ।

রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত, একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ এবং সমাজের সমষ্টিগত সম্পদকে একত্রে জাতীয় সম্পদ বলে। তাছাড়া কোনো জাতির নাগরিকের গুণবাচক বৈশিষ্ট্য, যেমন– কর্মদক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি প্রযুক্তিগত জ্ঞান ইত্যাদি জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো কোনো সম্পদ আছে, যা বিশেষ কোনো রাষ্ট্রের মালিকানাধীন নয়। বিশ্বের সকল জাতিই সেগুলো ভোগ করতে পারে। এগুলো আন্তর্জাতিক সম্পদ। উদাহরণ হিসেবে সাগর-মহাসাগর, পেটেন্টবিহীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রযুক্তি ইত্যাদির কথা বলা যায়।

### জাতীয় সম্পদের উৎস

জাতীয় সম্পদের উৎস প্রধানত দুটি। প্রথমটি প্রকৃতি প্রদত্ত আর দ্বিতীয়টি মানবসৃষ্ট। কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার ভিতরের ভূমি, ভূমির উপরিস্থিত এবং অভ্যন্তরস্থ যা কিছু সবই প্রকৃতির দান। প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ও বনের গাছপালা–ফলমূল–প্রাণী ও পাখিকুল, নদ–নদী ও প্রাকৃতিক জলাশয় এবং এগুলোর মৎস্যসম্পদ, অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ, ভূমির অভ্যন্তরস্থ পানি ও সকল রকম খনিজ সম্পদ–এ সবই প্রকৃতি প্রদত্ত জাতীয় সম্পদ।

কোনো দেশের অধিবাসীরা তাদের শ্রম ও মূলধনের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার, সংগ্রহ ও উত্তোলন করে এবং সেগুলোর রূপান্তর বা স্থানান্তর করে যে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করে তা মানবসৃষ্ট সম্পদ। মানুষ ভূমি আবাদ করে শস্য–ফল–ফুল–গাছপালা উৎপাদন করে। জলাশয়ে মাছ চাষ করে, খনিজসম্পদ উত্তোলন করে ব্যবহার উপযোগী করে। এছাড়া ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে বা সরকারের অর্থ ও পরিচালনায় রাস্তাঘাট, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, সেতু এবং নানারকম স্থাপনা নির্মাণ করে এবং নানারকম শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে। এভাবে দেশের নাগরিকেরা সারা বছরব্যাপী নানারকম অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবা অর্থাৎ সম্পদ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত থাকে। এসব মানবসৃষ্ট সম্পদ।

## জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয়রোধ

সংরক্ষণের অর্থ বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান। আমরা জানি, একটি দেশের সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমষ্টিগত সম্পদ একত্রে জাতীয় সম্পদ। সমষ্টিগত সম্পদের মধ্যে সকল জনগণ সম্মিলিতভাবে যেসব সম্পদের মালিক সেগুলো এবং রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সকল প্রাকৃতিক ও উৎপাদিত সম্পদ অন্তর্ভুক্ত। তাই জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ বলতে ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমষ্টিগত সম্পদ উভয়েরই সংরক্ষণ বোঝায়।

### (ক) ব্যক্তিগত সম্পদ সংরক্ষণ

কোনো বস্তু, দ্রব্য, প্রতিষ্ঠান, সম্পত্তি, বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষা করা ও তার তত্ত্বাবধান করাকে বলে সংরক্ষণ। ব্যক্তি সাধারণত তার নিজস্ব সম্পদ, যেমন–অর্থ সম্পদ, ভূসম্পত্তি, স্বর্ণ–রৌপ্য, অলংকার, আসবাবপত্র, নিজস্ব কলকারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান, যানবাহন ইত্যাদি নিজ স্বার্থেই বিশেষ যত্নের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করে। শুধু তাই নয়, সে এগুলোর উন্নয়ন করতে ও বৃদ্ধি করতেও তৎপর থাকে। এছাড়া প্রত্যেকেই নিজস্ব সম্পদের অপচয় রোধ করতে এগুলোর তত্ত্বাবধানও করে। কোন সম্পদ কোথায় কী অবস্থায় আছে তার খোঁজখবর রাখা, সম্পদের কোনোরকম ক্ষতির কারণ ঘটলে তা রোধ করা বা দূর করা, সম্পদ নষ্ট হলে যথাসম্ভব তা পূরণ করার ব্যবস্থা নেওয়াও সংরক্ষণ কাজের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তি সাধারণত তার নিজস্ব সম্পদ অযথা ব্যয় করে না বা অপচয় করে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় না করার জন্য সে সর্বদা সতর্ক থাকে।

### (খ) সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণ

রাস্তাঘাট, সেতু, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন যানবাহন (গাড়ি, ট্রেন, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি) ও কলকারখানা, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, অফিস ভবন, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমি ও ভূমির উপরিস্থিত এবং অভ্যন্তরভাগের সম্পদ (বনাঞ্চল, নদীনালা, জলাশয়, মৎস্যসম্পদ, খনিজসম্পদ ইত্যাদি)-এসবই সমষ্টিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র ও জনগণ সম্মিলিতভাবে এসব সম্পদের অধিকারী। জনগণ এগুলো ব্যবহার করে ও ভোগ করে। এগুলোর পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্র জনগণের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাই এসব সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণে প্রতিটি নাগরিকেরই বিশেষ যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া সমষ্টিগত সম্পদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের যথাযথভাবে তার দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক।

### বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে করণীয়

- জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় যেসব ব্যবস্থা আছে, সেগুলো যাতে কোনোভাবে ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা। আমরা জানি যে, সেতু, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, অফিস ভবন ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিরাপত্তা রক্ষী থাকে। এসব কোনো সময় অরক্ষিত দেখলে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো।
- কেউ যেন এসব সম্পদের কোনো ক্ষতিসাধন না করে সে বিষয়ে সচেতন থাকা। এ ধরনের কোনো অপচেষ্টার বিষয়ে জানলে বা দেখলে যথাযথ ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে অবৈধভাবে গাছ কাটা, পশুপাখি শিকার করা ইত্যাদি জাতীয় সম্পদের ক্ষতিসাধন করা হিসেবে গণ্য হবে।
- জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন ও বৃদ্ধিসাধনের জন্য সচেষ্ট থাকা।
- সমষ্টিগত বা জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়রোধে সচেতন ও সচেষ্ট থাকা, যেমন– রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি অপ্রয়োজনে খরচ না করা এবং এগুলো ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া।
- সম্পদ সংরক্ষণের জন্য নিজ নিজ কর্তব্য বিষয়ে প্রতিটি নাগরিক সচেতন ও সচেষ্ট থাকলে জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও এগুলোর অপচয় রোধ করা কঠিন নয়। নাগরিকদের সচেতন করার জন্য গণমাধ্যমে তাদের করণীয় সম্পর্কে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সম্পদ সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য নির্ধারিত সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য সংস্থার দলিলসমূহে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত থাকে। সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দের এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে তৎপর থাকা এবং
- এসব দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।

> **কাজ**
>
> দলগত : কয়েকটি জাতীয় সম্পদ চিহ্নিত কর এবং এগুলো সংরক্ষণের কয়েকটি পদক্ষেপ লিখ।
>
> একক : ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে জাতীয় সম্পদ কীভাবে আলাদা করবে? খাতায় লিখে দেখাও।

## বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

মানুষের প্রয়োজন বহুবিধ। তার খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন। সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যেরও প্রয়োজন। এছাড়া সুন্দরভাবে বাঁচতে হলে প্রয়োজন বিনোদনের ব্যবস্থা, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ পরিবার এবং সমাজ ব্যবস্থা। এসব প্রয়োজন থেকে অভাবের সৃষ্টি হয়। সম্পদ সবসময়ই অপ্রতুল। অভাব পূরণের জন্য মানুষ চেষ্টা করে এবং উৎপাদন করে। উৎপাদন হলো দ্রব্য বা সম্পদের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর।

যেমন, কাঠ থেকে চেয়ার তৈরি করা হয়। এ রূপান্তরই উৎপাদন। উৎপাদনের জন্য চারটি উপাদান আবশ্যক : ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো–

**ভূমি :** সাধারণ অর্থে ভূমি বলতে জমি বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে ভূমি বলতে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন– জমি, জমির উপরিস্থিত এবং অভ্যন্তরের সকল কিছুকে বোঝায়।

**শ্রম :** উৎপাদন কাজে ব্যবহারযোগ্য মানুষের শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতাকে শ্রম বলে।

**মূলধন :** উৎপাদিত উপাদানকে মূলধন বলে। মূলধন হলো সেই ধরনের সম্পদ যা সরাসরি ভোগ করা হয় না কিন্তু যা কাজে লাগিয়ে অধিকতর উৎপাদন করা হয়। যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত ভবন, অর্থ ইত্যাদি হলো মূলধন।

**সংগঠন :** উৎপাদনের তিনটি উপকরণ, যথা– ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে সমন্বিত করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা ও সম্পাদন করাকে বলে সংগঠন। যিনি সংগঠন করেন, তাকে বলে সংগঠক বা উদ্যোক্তা। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা রয়েছে, সংগঠক সেটা বহন করেন।

চেয়ারের জন্য কাঠ সংগ্রহ হয় ভূমি থেকে। কাঠ সংগ্রহের জন্য অর্থ এবং কাঠকে চেয়ারে রূপান্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ প্রয়োজন। এই অর্থ ও যন্ত্রপাতি মূলধন। এরপর প্রয়োজন শ্রমিক বা কারিগর, যিনি যন্ত্রপাতি ও নিজ শ্রমের সাহায্যে কাঠ থেকে চেয়ার তৈরি করবেন। আর এই ভূমি, মূলধন ও শ্রমকে সমন্বিত করে চেয়ার উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবেন সংগঠক বা উদ্যোক্তা।

এভাবে মানুষ সবসময়ই তার বিভিন্ন অভাব পূরণের জন্য এই চারটি উপাদানের সাহায্যে প্রচেষ্টা চালায়। উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য উক্ত চারটি উপাদান অপরিহার্য। মোট উৎপাদিত সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ চারটি উপাদানের মধ্যে অর্থাৎ খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসেবে ভাগ হয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়। এই আয়ের সাহায্যে ভূমির মালিক, শ্রমিক, পুঁজিপতি বা মূলধনের মালিক এবং উদ্যোক্তা তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন বা অভাব পূরণ করে। কোনো বস্তুগত বা অবস্তুগত দ্রব্যের অর্থাৎ সেবার জন্য অনুভূত প্রয়োজনই অভাব। অভাব হলো কোনো বস্তু বা সেবা পাবার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। উৎপাদিত সম্পদ উৎপাদনের উক্ত চারটি উপাদানের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে বণ্টন।

আমরা এ আলোচনা থেকে বলতে পারি, মানুষ তার নানাবিধ অভাব পূরণের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করে। এর বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে :

**অভাব → প্রচেষ্টা → উৎপাদন → বণ্টন → ভোগ**

উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমির ব্যবহারের জন্য ভূমির মালিককে খাজনা দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে শ্রমিককে মজুরি, মূলধনের মালিককে সুদ এবং সংগঠককে মুনাফা দেওয়া হয়। এইসব পারিতোষিক, যেমন– খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা উপাদানসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে বণ্টিত হলে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতি আসে ও অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়। আর বণ্টনব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম হলে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়, জীবনযাত্রার মানে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটতে পারে না। সমাজে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

মোট উৎপাদিত সম্পদের অর্থমূল্য কীভাবে উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হয়, তা নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা Economic System -এর ওপর। যে ব্যবস্থা বা কাঠামোর আওতায় উৎপাদনের উপাদান-সমূহের মালিকানা নির্ধারিত হয় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন ও ভোগ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। এ ব্যবস্থা জনগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং অর্থনীতিবিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।

বর্তমান বিশ্বে প্রধানত চার ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর আছে: ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র ও ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ অধ্যায়ে আমরা চারটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় কীভাবে উৎপাদন ও বণ্টনের কাজটি সমাধা হয়, সে বিষয়েই জানবো। এটা জানতে হলে উক্ত চারটি ব্যবস্থাধীনে অর্থনীতির কার্যপ্রণালি ও বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে হবে।

## ১. ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

• **উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা :** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ, যথা- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন ব্যক্তিমালিকানাধীন। অর্থাৎ ব্যক্তি তার সম্পদ/আয়ের সাহায্যে ভূমির মালিকানা অর্জন করতে পারে, শ্রমিককে নিয়োগ দিতে পারে, মূলধন বা পুঁজি গঠন করতে পারে। ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্পদ স্বাধীনভাবে ভোগ ও হস্তান্তর করতে পারে। এসব বিষয়ে ব্যক্তি নিজেই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

• **উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা :** ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি এককভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে যে কোনো দ্রব্য/সেবা উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে কোনোরকম বিধিনিষেধ নেই। এ ব্যবস্থায় প্রায় সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে অনেক সময় মুক্তবাজার অর্থনীতি বলা হয়। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দ্রব্যের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ সবই বাজারে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া দ্বারা পরিচালিত হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা এবং উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা। এসব ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ নাই বললেই চলে।

• **অবাধ প্রতিযোগিতা :** যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে পারে। তাই বাজারে একই দ্রব্যের বহুসংখ্যক উৎপাদক বা বিক্রেতা থাকেন এবং তাদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে। বিক্রেতা এবং দ্রব্যের ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।

> **কাজ**
> একক : ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আয়বণ্টন সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

• **ভোক্তার স্বাধীনতা :** মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগিতা ব্যবহার করার প্রক্রিয়াকে ভোগ বলে। খাদ্য দ্বারা মানুষ ক্ষুধা মেটায়। সুতরাং খাদ্যবস্তু মানুষ ভোগ করে। কিন্তু কোনো কারণে খাদ্যবস্তু নষ্ট হলে তা ভোগ হবে না। মানুষের অভাব পূরণের জন্য ব্যবহার করা হলেই ভোগ হবে। ভোক্তা কোনো দ্রব্য কী পরিমাণে ক্রয় ও ভোগ করবে, এ বিষয়ে সে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে তার পছন্দ, আয় ও দ্রব্যের বাজার মূল্যের দ্বারা এ সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়।

• **সর্বাধিক মুনাফা অর্জন :** ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। উৎপাদন কাজে নিয়োজিত অর্থ হচ্ছে বিনিয়োগ। বিদ্যমান মূলধন সামগ্রীর সাথে নতুন মূলধন (অর্থ বা যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল প্রভৃতি) যুক্ত হওয়াকে বলে বিনিয়োগ। যেসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে মুনাফার সম্ভাবনা বেশি, ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপাদনকারীরা সেসব দ্রব্যেই বেশি বিনিয়োগ করে।

• **শ্রমিক শোষণ :** সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে বলে উদ্যোক্তা বা পুঁজিপতিরা দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় কম রাখতে ও বিক্রয় মূল্য বেশি পেতে চেষ্টা করে। উৎপাদন ব্যয় কম রাখার জন্য শ্রমিককে তার ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি দেওয়া হয়। এই উদ্বৃত্ত মজুরি পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তার কাছে মুনাফা হিসেবে সঞ্চিত হয়। এভাবে উৎপাদিত সম্পদ বণ্টনে অসমতা ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়। শ্রমিক প্রাপ্যের চেয়ে কম মজুরি পান আর পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তা তাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করেন। যেহেতু পুঁজিপতির সংখ্যা কম, তাই একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর হাতেই সমাজের অধিকাংশ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। আর যেহেতু শ্রমিক অগণিত, তাই সমজের বিশাল জনগোষ্ঠী মোট সম্পদের ক্ষুদ্র অংশের সুবিধা ভোগ করে।

## ২. সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা, উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে আলাদা। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

• **উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা :** সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসহ সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। সম্পদের ওপর কোনো রকম ব্যক্তিমালিকানা থাকে না। সমাজতন্ত্র হচ্ছে 'সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠন'। এই সংগঠনের মাধ্যমেই রাষ্ট্র উৎপাদনের চারটি উপাদানকে সমন্বিত করে একটি সার্বিক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদন কার্যের নির্দেশনা দেয় ও তা পরিচালনা করে। সমাজের সকল সদস্য এই পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সর্বাধিক কল্যাণ অর্জন করবে–এটিই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

• **অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে সরকারি নির্দেশনা :** সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সরকার দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। কোনো দ্রব্য কী পরিমাণে, কখন ও কোন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হবে এবং এই দ্রব্য কাদের নিকট সরবরাহ করা হবে–এ সবই সরকার নির্ধারণ করে। এসব সিদ্ধান্ত সরকারের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনারই অংশ। এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ ও বিনিয়োগের সুযোগ নেই।

> **কাজ**
>
> দলগত : ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান তিনটি পার্থক্য চিহ্নিত কর।

• **ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব :** সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদকের যেমন উৎপাদন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা নেই, তেমনি ভোগকারীর নিজ ইচ্ছামতো দ্রব্যসামগ্রী ভোগের সুযোগ নেই। উৎপাদক সরকার নির্ধারিত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে এবং ভোগকারী সেগুলো প্রয়োজন মতো ক্রয় ও ভোগ করে। তবে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্বাচন ও ক্রয়ের ব্যাপারে ভোক্তার স্বাধীনতা আছে।

• **অর্থনৈতিক কার্যাবলির উদ্দেশ্য :** সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এখানে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই।

• **আয় বণ্টন :** ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুনাফার মধ্যে শ্রমিকের মজুরির একটি অংশ থাকে, যা তাকে দেওয়া হয় না। পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তা এ মুনাফা গ্রহণ করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্জিত মুনাফার মালিক রাষ্ট্র বা সরকার। একইভাবে ভূমির খাজনা ও মূলধনের সুদও সরকারের কোষাগারেই জমা হয়। কারণ সরকারই ভূমি ও মূলধনের মালিক।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রই শ্রমিকের মজুরি প্রদান করে এবং উৎপাদনের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করে। ফলে ধনতন্ত্রের মতো পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিককে বঞ্চিত করার সুযোগ থাকে না। এখানে শ্রমিকের মজুরি প্রদানের মূলনীতি হলো–'প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।' এই ব্যবস্থায় বেকারত্ব থাকে না। কারণ রাষ্ট্র প্রত্যেকের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। সকলের আয় এক নয়। কিন্তু কেউ উৎপাদনে তার অবদান অনুসারে প্রাপ্য আয় থেকে বঞ্চিত হয় না। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে অর্জিত সম্পদের সুষম বণ্টন হয়। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আয় বৈষম্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আয় বৈষম্যের চেয়ে কম। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আওতায় রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। তাই সম্পদের অপচয়ও অপেক্ষাকৃত কম। এর ফলে মোট জাতীয় উৎপাদনও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত নয়, মালিকানা রাষ্ট্রের। আবার উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা নেই। ফলে উৎপাদন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রণোদনা ও উদ্যম হ্রাস পেতে পারে। এতে সম্পদের কাম্য ব্যবহার বিশেষত ব্যক্তির সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা ও সৃজনশীলতা নিশ্চিত করা যায় না।

## ৩. মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বে আর একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজমান। সেটি হচ্ছে মিশ্র অর্থনীতি। এটি ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় দ্রব্য উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগের ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত, তেমনি সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন ও বিনিয়োগের ব্যবস্থাও রয়েছে। অর্থনীতির কোনো কোনো খাত বা খাতের অংশবিশেষ সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। মিশ্র অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- **সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান**

মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি কিছু কিছু খাতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারি মালিকানা, উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকে। জনসাধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ও সেবা, যেমন– যোগাযোগ ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষার আয়োজন প্রভৃতি প্রধানত সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। তবে এক্ষেত্রেও আংশিক ব্যক্তিগত বা বেসরকারি উদ্যোগ দেখা যায়।

এছাড়া মৌলিক ও বৃহদায়তন শিল্প, জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, বড় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ, শিশুখাদ্য এসবও সাধারণত সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে।

আবার মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগপণ্য, যেমন– কৃষিপণ্য, কাপড় ও তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াকৃত খাদ্যদ্রব্য, হোটেল–রেস্তোরাঁ, ব্যক্তিগত যানবাহন ইত্যাদি প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদিত ও সরবরাহ করা হয়।

- **প্রতিযোগিতা** : মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তি বা বেসরকারি খাতেরই প্রাধান্য থাকে। তাই দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদকদের প্রতিযোগিতা এবং দ্রব্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাজারে চাহিদা ও যোগানের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া–বিক্রিয়া বিরাজমান। দাম ও সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে ক্রেতার পছন্দ ও উদ্যোক্তার বিনিয়োগ স্থির হয়।

- **মুনাফা অর্জন** : মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পত্তিতে ব্যক্তির মালিকানা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও বেসরকারি খাতের প্রাধান্য থাকে। তাই উৎপাদনকারীদের সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল উদ্দেশ্য থাকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। এমনকি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খাতসমূহও কমবেশি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত থাকে।

তবে জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি বিশেষত সেবামূলক অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে (যেমন–স্বাস্থ্য, শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি) মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে না। আরও কিছু জনকল্যাণমূলক খাত, যেমন–টেলিযোগাযোগ, পরিবহন ইত্যাদিতে মুনাফা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হয়।

- **উদ্যোক্তা ও ভোগকারীর স্বাধীনতা** : মিশ্র অর্থনীতিতে বিশেষত জনসাধারণের ব্যবহার্য অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসার ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত থাকে। ফলে এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে একাধিক উৎপাদনকারী প্রতিযোগিতামূলক দামে দ্রব্যটি বাজারে ছাড়তে বাধ্য হন। এতে জনসাধারণ উপকৃত হয়।

এ অর্থ ব্যবস্থায় ভোগকারী অবাধে সাধারণ দ্রব্য ক্রয়–বিক্রয় ও ভোগ করতে পারে। তবে বিশেষ অবস্থায় বা দুর্যোগকালে উৎপাদনে বিপর্যয় ঘটলে সরকার যে কোনো দ্রব্যের ক্রয়–বিক্রয়ে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করতে পারে।

**আয় বণ্টন :** মিশ্র অর্থনীতির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বণ্টনও প্রভাবিত হয়। ব্যক্তি মালিকানার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বড়ো অংশ, যেমন–বড়ো বড়ো কলকারখানা, ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন এবং আমদানি–রপ্তানি সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থনীতির ব্যক্তি মালিকানাধীন অংশ ব্যক্তির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এ খাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতোই শ্রমিককে প্রাপ্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি দেওয়া হয়। উদ্বৃত্ত মজুরি ব্যক্তির মুনাফার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে উৎপাদিত সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হয় না। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের আয়ে বৈষম্য দেখা দেয়। এতে সমাজের সকল জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা যায় না।

মিশ্র অর্থনীতিতে উৎপাদনের যে অংশ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন, সে অংশে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নয় বরং সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ খাতের আওতাধীন কলকারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকরা সাধারণত ন্যায্য মজুরি পায়। ফলে সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়।

মিশ্র অর্থনীতিতে সম্পদ বা আয়ের আংশিক সুষ্ঠু বণ্টন ঘটে। আর অংশবিশেষে শ্রমিক শোষিত ও বঞ্চিত হয়। ফলে আয় বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

## ৪. ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্টসমূহ

ইসলামি অর্থব্যবস্থা ঐতিহ্য বা কিতাব থেকে উৎসারিত ব্যবস্থা যা পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যে কাজ করে। সৃষ্টিকর্তা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম দ্রব্যসামগ্রী, জীবজন্তু, পরিবেশ এবং বস্তুসমূহও সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত এসকল বস্তুসামগ্রী ও পরিবেশ–প্রকৃতি ব্যবহার করে ধর্মানুমোদিতভাবে অধিকতর সম্পদ সৃষ্টি ও ভোগ করবে এটাই ইসলামি অর্থব্যবস্থার বিধান।

ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও হাদিস। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপাদন ও বণ্টনের বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে হবে।

- **সম্পদের মালিকানা :** ইসলামে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পদ মানুষ তার ইচ্ছামতো ব্যবহার ও ভোগ করতে পারে। এ সম্পদ সে তার উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তর করতে পারে।

- **শরিয়াভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল কার্যাবলি শরিয়া বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মৌল স্তম্ভ, পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলি এবং রাসুল (সা.) এর হাদিসের বিধান অনুসারে অর্থনৈতিক কার্যাবলির মৌলিক নীতিমালা নির্ধারিত হয়।

- **উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদনের উপাদানসমূহের পারিতোষিক :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যে কোনো ব্যক্তি একক বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে শরিয়াসম্মত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ করতে পারে। সে নিজেও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। উৎপাদনের লক্ষ্য হলো 'হালাল' বা ইসলামসম্মত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন নিশ্চিত করা। সামাজিক কল্যাণমুখী শোষণহীন উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বৃহদায়তন উৎপাদন কার্যক্রম প্রচলিত আছে। এ ব্যবস্থার ব্যক্তিগত বা বেসরকারি উদ্যোগ নাই এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদন কার্যক্রম গৃহীত হয়। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ থাকলে তার একটি নির্ধারিত অংশ দরিদ্র জনগণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থাকে বলে জাকাত। সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য জাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক। ন্যূনতম যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে জাকাত দিতে হয় তাকে ইসলামি পরিভাষায় নিসাব বলে।

যে কোনো অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের অন্যতম উপাদান পুঁজি বা মূলধন। মূলধনের জন্য সুদ প্রদানের ব্যবস্থা আছে। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সুদ লেনদেন হারাম বা নিষিদ্ধ। ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদমুক্ত আমানত রাখা ও ঋণ গ্রহণ করার ব্যবস্থা আছে। উৎপাদক ও ব্যবসায়ী এই ঋণ গ্রহণ করতে পারেন এবং ব্যবসায় থেকে প্রাপ্ত লাভ থেকে ঋণদানকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে (অর্থাৎ ব্যাংক) লভ্যাংশ পরিশোধ করতে পারেন। এ অর্থব্যবস্থায় শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এর ফলে উৎপাদিত সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন সম্ভব হয়।

> **কাজ**
>
> একক : নিজ দেশে তোমাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ক্ষমতা দেওয়া হলে তুমি কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে? কেন?
>
> দলগত : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চিহ্নিত করে এর বন্টন কার্যক্রমের সমস্যাগুলো লেখ।

## বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

প্রাচীন বাংলায় এবং মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশে প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এ ব্যবস্থা ছিল ভূস্বামীকেন্দ্রিক। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূমির মালিককে ভূস্বামী বলা হতো। অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। একজন ভূস্বামী ছিলেন অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার নিয়ন্ত্রণে সকল বৃত্তি ও পেশার লোকজন, যেমন–কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে, ছুতার, স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি থাকতেন। এমনকি তার সম্পদ বা সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব প্রজাকুল বা লাঠিয়াল বাহিনী থাকত। ব্রিটিশ শাসনামলে এই ভূস্বামীদের বলা হতো জমিদার।

পাকিস্তান আমলে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থান করে নেয়। তবে বেশ কিছুকাল যাবৎ জমিদারি প্রথার প্রভাবও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পাশাপাশি চালু ছিল। পাকিস্তান আমলের শেষদিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রাধান্য লাভ করে। দেশের জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশের হাতে দেশের অধিকাংশ মূলধন ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়।

১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর দেশে সমাজতন্ত্র অভিমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বড়ো বড়ো কলকারখানা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বিমা কোম্পানি, পরিবহন, প্রধান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক শিক্ষা, আমদানি–রপ্তানি ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়। পাকিস্তান আমলে কলকারখানা, ব্যবসায় ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অধিকাংশই অবাঙালি মালিকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই অবাঙালি মালিকেরা স্বাধীনতার পর দেশত্যাগ করলে এসব প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়। আবার সদ্য স্বাধীন দেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি, অবকাঠামো ও বিপর্যস্ত সমাজের সমস্যা ও সংকট মোকাবিলায় সরকারকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে দক্ষ প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, উদ্যোক্তাসহ মানবসম্পদের ব্যাপক ধ্বংস সাধিত হয়। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান লোকসানের সম্মুখীন হয়। ফলে বেসরকারি খাত ও ব্যক্তি উদ্যোগকে সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বেসরকারি খাত ও ব্যক্তি উদ্যোগ সম্প্রসারণের এই ধারা বর্তমান সময় পর্যন্ত চালু আছে। এই ধারায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে রাষ্ট্রীয়করণকৃত কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীয়করণ করা শুরু হয়। বর্তমান

বিশ্বে বিরাজমান অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সমতালে চলার লক্ষ্যে মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অর্থনীতিকে পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে অর্থনীতির কিছু খাতে সরকারি–বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও নানারকম সংস্কার এবং পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছে। বর্তমানে দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাধান্যসহ মিশ্র অর্থনৈতিক অবস্থা বিদ্যমান। প্রধান প্রধান শিল্প, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অন্তর্ভুক্ত। তবে অর্থনীতির প্রায় সব খাত ক্রমশ বেসরকারি উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আর একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বেসরকারি উদ্যোগ সম্প্রসারণের সাথে সাথে বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়ায় দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। এই দামই আবার উৎপাদনের প্রকৃতি ও পরিমাণ এবং ক্রেতার ভোগকে প্রভাবিত করে।

দেশে উৎপাদনের জন্য যে মূলধন বা পুঁজি প্রয়োজন, তা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই বেশিরভাগ সংগৃহীত হয়। তবে বৈদেশিক ঋণ, সাহায্য, অনুদান এবং ব্যক্তিগত পুঁজিও এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দেশে উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান রয়েছে। বেসরকারি খাত ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে উদ্যোক্তা ও ভোগকারীর স্বাধীনতা আছে। যে কোনো উদ্যোক্তা বা উৎপাদনকারী যে কোনো দ্রব্য যে কোনো পরিমাণ উৎপাদন করতে পারে। এই উৎপাদন কার্য অবশ্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়।

## বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বন্টন পরিস্থিতি

উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে প্রধানত ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। তবে অর্থনীতির কিছু খাতে বিশেষত সেবাখাতে সরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তাই এটাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থাও বলা যায়।

আমরা জানি ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন উৎপাদনের চারটি উপাদান। ভূমির আয়কে খাজনা আর শ্রমের আয়কে বলে মজুরি। মূলধনের আয় হলো সুদ এবং সংগঠন বা উদ্যোক্তার আয় হচ্ছে মুনাফা। এ চারটির সমষ্টিই জাতীয় আয়।

উৎপাদনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলধনের মালিক বা পুঁজিপতি এবং সংগঠক একই ব্যক্তি। কারণ মূলধন ছাড়া উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় না। বাংলাদেশের জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশ পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তা। বৃহত্তর অংশই শ্রমিক বা মজুর।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য পুঁজিপতির দ্বারা শ্রমিকের শোষণ। শ্রমিককে তার প্রাপ্য ও ন্যায্য মজুরি দেওয়া হয় না। তার প্রাপ্য মজুরির একটি বড়ো অংশ পুঁজিপতিদের কাছে সুদ ও মুনাফা হিসেবে সঞ্চিত হয়। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের বৃহত্তর অংশ অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ভোগ করে আর ক্ষুদ্রতর অংশ বন্টিত হয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

বাংলাদেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতো বাংলাদেশেও শ্রমিকদের মজুরির নিম্নহার এবং উদ্যোক্তাদের মুনাফার উচ্চহার লক্ষণীয়। সুদ এবং খাজনা উচ্চহারে পরিশোধ করা হয়। সরকারি খাতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকায় শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি তুলনামূলকভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। তবে অর্থনীতির খাতসমূহের অধিকাংশই বেসরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকায় বাংলাদেশে আয় বৈষম্য রয়েছে। ফলে শ্রমিক শ্রেণির জীবনযাত্রার মান নিম্ন।

> **কাজ**
>
> একক : বাংলাদেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কী পরিবর্তন আনলে আয় বৈষম্য কমে যাবে বলে তুমি মনে কর?

# অনুশীলনী

## সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উদ্যোক্তা কাকে বলে?

২. ব্যক্তিগত সম্পদের উদাহরণ দাও।

৩. জাতীয় সম্পদ কী?

৪. সমষ্টিগত সম্পদকে তুমি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবে?

## বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে রাষ্ট্রের করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা কর।

২. ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধর।

৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত কর।

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সমষ্টিগত সম্পদ নিচের কোনটি?

ক. ঘরবাড়ি

খ. সাগর

গ. কলকারখানা

ঘ. বনাঞ্চল

২. উপরের কোন বৃত্তে ব্যক্তিগত সম্পদ রয়েছে?

ক. ১

খ. ২

গ. ১ ও ২

ঘ. ২ ও ৩

৩. মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো–

i. সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সরকারি খাতের প্রাধান্য

ii. কোনো দ্রব্য কী পরিমাণ উৎপাদিত হবে সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত থাকে

iii. একক উৎপাদনকারী হিসেবে একক ব্যবস্থার প্রচলন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. i ও ii
গ. iii
ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

গাজীপুর জেলার বকুলপুর গ্রামের তানভীর লক্ষ করলেন কতিপয় লোক বনের গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। তানভীর গ্রামের লোকজনের সহায়তায় গাছ কাটার সঙ্গে জড়িত লোকদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

৪. তানভীরের কাজটি জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধের কোন ধরনের উদ্যোগ?

ক. ব্যক্তিগত
খ. রাষ্ট্রীয়
গ. সমষ্টিগত
ঘ. আন্তর্জাতিক

৫. উক্ত উদ্যোগটি গ্রহণের ফলে–

i. জাতীয় সম্পদ রক্ষা পাবে
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে
iii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পার্থ 'ক' নামক দেশের নাগরিক। তিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন সে দেশে ব্যক্তিগত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায় না। পার্থর বাবা উক্ত 'ক' দেশে যে কারখানায় কাজ করতেন তার প্রাপ্য মজুরির একটি অংশ প্রয়োজন অনুসারে তাকে দেওয়া হতো। সাম্প্রতিককালে পার্থ 'খ' নামক দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন। তিনি সেখানে এক লক্ষ ডলার খরচ করে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি তার আয় দিয়ে আরও একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।

ক. সম্পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
খ. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. পার্থের 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থার ধরনটি তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'খ' দেশে যে ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত তার সাথে 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থার পার্থক্য রয়েছে–যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।